তন্ত্রসাধনা : গুপ্তযুগের সাহিত্যে ও লেখমালায় তন্ত্রসাধনার আভাস আছে। এ যুগেরই গাঙ্গধার শিলালেখে স্থানীয় একটি মাতৃকামন্দিরে ডাকিনীদের তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপের স্পষ্ট উল্লেখ আছে।

তন্ত্রসাধনার লক্ষ্য ব্রহ্মোপলব্ধি বা আত্মজ্ঞানলাভ। এরই নাম মোক্ষ বা মুক্তি। দেহস্থিত সুপ্ত শক্তিকে পূর্ণ বিকশিত করলে এই মুক্তি আসে। এই সাধনার তিনটি পর্যায়। পর্যায়গুলি হল পশ্বাচার, বীরাচার ও দিব্যাচার। সাধনার প্রথম স্তর পশ্বাচার। পশু বলতে জীবকে বোঝায়। ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, শঙ্কা, জুগুপ্সা, কুল, শীল ও জাতি এই আটটি পাশের দ্বারা সে বদ্ধ। এই পাশের বাঁধন থেকে জীবকে বেরিয়ে আসতে হবে। এর জন্য চরিত্র ও সদ্‌গুণের অনুশীলন প্রয়োজন। এই অনুশীলনে সফলতা এলে জীব পশু থেকে বীরে পরিণত হবেন। বীরের পর্যায়ে উন্নীত হলে সাধক পঞ্চতত্ত্বের অনুশীলন করবেন। পঞ্চতত্ত্ব বলতে অনেকে মদ, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা এবং মৈথুন বোঝেন। আবার অনেকে একে শিবশক্তি সামরস্য, শুদ্ধ চৈতন্য, সংযম, আত্মোন্নয়ন এবং পরমাত্মায় জীবাত্মার নিঃশেষে নিলয় অর্থে গ্রহণ করেন। কিন্তু এই পর্বে সাধকের অবিদ্যা পুরোপুরি দূর হয় না, তাঁর মধ্যে দ্বৈতভাব থেকেই যায়। বীরাচারের পরবর্তী স্তর দিব্যাচার। এই পর্বে সাধককে দু'টি আচার অনুশীলন করতে হয়। এদের একটি সিদ্ধান্তাচার, অন্যটি কৌলাচার। সিদ্ধান্তাচারে সাধকের মনে ত্যাগের বাসনা জন্মায়, কৌলাচারে মোক্ষের দ্বার উন্মুক্ত হয়। এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলে কর্দমে ও চন্দনে, পুত্রে ও শত্রুতে, কাঞ্চনে ও তৃণে সাধকের আর কোনও ভেদজ্ঞান থাকে না। তিনি অদ্বৈত জ্ঞানের অধিকারী হন। উপাস্য দেবতার সত্তায় নিজের সত্তা ডুবিয়ে তিনি নির্মল আনন্দ উপভোগ করেন।

তন্ত্র কোনও ধর্ম নয়, এক সাধনমার্গ। শাক্তধর্মে যেমন, তেমনি বৈষ্ণব, বৌদ্ধ ও জৈনধর্মেও এই সাধনমার্গ সমাদরে গৃহীত হয়েছে। অন্তত দু'টি কারণে তন্ত্রসাধনার অশেষ তাৎপর্য রয়েছে। প্রথমত, তন্ত্র জাতিভেদ মানে না। তন্ত্রসাধনায় হাড়ি, ডোম বা চণ্ডালও গুরুর পদ লাভ করতে পারেন। দ্বিতীয়ত, তন্ত্রে নারীজাতির প্রতি সশ্রদ্ধ মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। তাঁদের গুরু এবং দীক্ষাদাত্রী হওয়ার অধিকার দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়, এক তান্ত্রিক ভৈরবী রামকৃষ্ণকে দীক্ষা দিয়েছিলেন, তাঁকে পরমহংস বলে ঘোষণা করেছিলেন।

Scanned by CamScanner